সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থা

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কনভেনশন

৩০ সেপ্টেম্বর ২০১২

সম্পাদকীয় প্রতিবেদন

স্থান

দ্বারভাঙ্গা হল

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

কলেজ স্ট্রিট ক্যাম্পাস

রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ এক সময় পর্বে সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থা'র (এ আই পি এস ও) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কনভেনশনে আজ (৩০ সেপ্টেম্বর ২০১২) আমরা মিলিত হয়েছি। আগামী ৫-৭ অক্টোবর পণ্ডিচেরীতে এ আই পি এস ও-র জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। জাতীয় সম্মেলন উপলক্ষেই রাজ্য কনভেনশনের আয়োজন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০০৭ সালের ৭-৯ এপ্রিল বিহারের পাটনায় এ আই পি এস ও-র বিগত জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ আই পি এস ও-র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্সংহত করার ক্ষেত্রে পাটনা জাতীয় সম্মেলনের বিশেষ গুরুত্ব সম্পর্কে আমরা সকলেই অবহিত। শান্তি ও সংহতি আন্দোলনের দীর্ঘ কয়েক দশকের ঐতিহ্যকে স্মরণে রাখলে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে নতুনতর চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় এরকম গণতান্ত্রিক একটি সংগঠনকে আরও কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্য প্রস্তুত করে তোলা ছিল সময়ের দাবি। পাটনা সম্মেলন সেদিক থেকে নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছিল।

পশ্চিমবঙ্গ থেকে পাটনা সম্মেলনে কয়েকজন প্রতিনিধি যোগদান করেছিলেন। কিন্তু জাতীয় সম্মেলন-পরবর্তী সময়েই এ আই পি এস ও পশ্চিমবঙ্গ শাখাকে পুনর্গঠিত করা হয়। পুনর্গঠিত রাজ্য শাখার আহ্বায়ক হন রবীন দেব। পুনর্গঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের রাজ্য শাখা কলকাতায় ভারত-ভিয়েতনাম মৈত্রী উৎসব (২-৪ সেপ্টেম্বর ২০০৭) সাফল্যের সঙ্গে আয়োজিন করেছিল। ২০০৭ সালের ৩১ জুলাই পুনর্গঠিত রাজ্য শাখার প্রথম বৈঠক থেকে ঐ মৈত্রী উৎসব আয়োজনের জন্য একটি প্রস্তুতি কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। ২০০৭ সালের ৭ আগস্ট কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজাবাজার বিজ্ঞান কলেজের মেঘনাদ সাহা সভাগৃহে আয়োজিত একটি সভা থেকে ঐ প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয়। বিভিন্ন গণসংগঠনের নেতৃত্ব ও সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিশিষ্ট মানুষজন ঐ সভায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। শান্তি ও সংহতি আন্দোলনের বহু অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ পশ্চিমবঙ্গে সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থার রাজ্য শাখা পুনর্গঠিত করে তোলার রাজনৈতিক গুরুত্ব আমরা সকলেই উপলব্ধি করতে পারি। এই পদক্ষেপের ফলে রাজ্যে সংগঠিত শান্তি ও সংহতি আন্দোলন নতুন এক পর্বে প্রবেশ করেছিল।

পশ্চাদপট

এ প্রসঙ্গে বাংলায় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও আধিপত্যবাদ-বিরোধী সচেতনতা ও সংহতিবোধের দীর্ঘ ঐতিহ্যের ক্রমবিকাশ আমরা স্মরণ করতে পারি।

আমরা গর্বের সঙ্গে উল্লেখ করতে চাই যে, ঊনবিংশ শতকের প্রথম দিকে সাইমন বলিভারের নেতৃত্বে লাতিন আমেরিকায় স্পেনীয় ঔপনিবেশিক শাসন মুক্তির সময়

ভারতে নবজাগরণের অগ্রপথিক রাজা রামমোহন রায় কলকাতায় বসে লাতিন আমেরিকার মুক্তি আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়েছিলেন। ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্যারি কমিউনের খবরাখবর ছাপা হয়েছিল অমৃতবাজার পত্রিকায়। বিশ শতকের প্রথমার্ধে বিশেষত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর আমাদের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও ঔপনিবেশিকতাবাদ-বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে যোগসূত্র গড়ে তুলতে থাকে। রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রতি সমর্থন জানিয়ে তৎকালীন বাংলা পত্র-পত্রিকায় বহু লেখাপত্র প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯২৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে আঁরি বাববুস ও রোঁমা রোঁলার নেতৃত্বে ব্রাসেলস শহরে লীগ এগেনস্ট ইম্পিরিয়ালিজমের মহাসম্মেলনের প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯৩০-র দশকের মাঝামাঝি লিগ এগেনস্ট ফ্যাসিজম অ্যান্ড ওয়ার'র ভারতীয় শাখা কমিটি গঠিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে। স্পেনে ও চীনে ফ্যাসিস্ত আগ্রাসনের বিরুদ্ধেও রবীন্দ্রনাথ এবং তৎকালীন বাংলা প্রদেশসহ ভারতের বহু বিশিষ্ট মানুষ তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। ১৯৩৬ সালের ৯ মে সমগ্র ভারতে 'আবিসিনিয়া দিবস' পালিত হয় আবিসিনিয়ায় ফ্যাসিস্ত ইতালির আগ্রাসনের প্রতিবাদে। ১৯৩৮ সালের ৯ জানুয়ারি তৎকালীন জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি জওহরলাল নেহরু 'চীন দিবস' পালনের আহ্বান জানান দেশবাসীর কাছে। ১৯৩৭ সালে চীনে মেডিক্যাল মিশন পাঠিয়েছিল জাতীয় কংগ্রেস। ১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর হিটলার বাহিনীর পোল্যান্ড আক্রমণের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা ঘটে। এর পরই কলকাতায় রবীন্দ্রনাথকে সভাপতি করে গঠিত হয় ইন্দো-পোলিশ অ্যাসোসিয়েশন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হবার পর এক মাসের মধ্যেই ১৯৪১ সালের ২১ জুলাই বাংলা জুড়ে পালিত হয় 'সোভিয়েত দিবস'। বাংলার মনীষীবৃন্দ এজন্য একটি আবেদনপত্র প্রকাশ করেন। এই আবেদনপত্রে প্রথম স্বাক্ষরকারী ছিলেন আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়। ঐ দিনই টাউন হলে বিশিষ্ট সাংবাদিক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভা থেকে গঠিত হয় সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি। কয়েক মাসের মধ্যে সোভিয়েত সুহৃত সমিতির সর্বভারতীয় একটি কমিটিও গঠিত হয়েছিল। বাংলাপ্রদেশে সমিতির সম্পাদক হয়েছিলেন কমরেড জ্যোতি বসু। বাংলাদেশে ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলনের ব্যাপকতাই যুদ্ধোত্তর পর্বে শান্তি ও সংহতি আন্দোলনের ভিত্তি রচনা করেছিল। যুদ্ধের পর ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী বিশ্বব্যাপী উদ্যোগের প্রতি বাংলার মানুষ ধারাবাহিক সমর্থন জানিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে ১৯৪৭-র ২১ জানুয়ারি বাংলাদেশে 'ভিয়েতনাম দিবস' পালনের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর

যুদ্ধোত্তর পর্বে সাম্রাজ্যবাদের সোভিয়েত-বিরোধী কর্মকাণ্ড ও ঠান্ডাযুদ্ধের পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে পরমাণু অস্ত্র প্রতিযোগিতার সূত্রপাত ঘটানোর প্রেক্ষাপটে শান্তি আন্দোলনের একটি নতুনতর আন্তর্জাতিক প্রাসঙ্গিকতা তৈরি হয়। বিশ্বজুড়ে বিবেকমান

মনীষীরা এগিয়ে আসেন শান্তি আন্দোলনকে আন্তর্জাতিক চেহারা দিতে। ১৯৪৮-র ২৫-২৮ আগস্ট পোল্যান্ডে আয়োজিত হয় শান্তির পক্ষে বুদ্ধিজীবীদের বিশ্ব কংগ্রেস। এই কংগ্রেস থেকে বিশ্বব্যাপী শান্তি আন্দোলন ছড়িয়ে দিতে চেয়ে একটি আবেদন প্রকাশ করা হয়। এর পর ১৯৪৯-র ২০-২৫ এপ্রিল প্যারিস ও প্রাগে যুগপৎ বসেছিল শান্তির জন্য বিশ্ব মহাসম্মেলন। ফ্রান্স সরকার সব প্রতিনিধিকে প্যারিসে আসার অনুমতি না দেবার জন্যই প্রাগে সমান্তরাল একটি সম্মেলন করতে হয়েছিল। এর পরই পশ্চিমবঙ্গে শান্তি সম্মেলনের প্রস্তুতি শুরু হয়। ১৯৪৯ সালের ১০ আগস্ট কলকাতার মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের আহ্বানে ৭০টি সাংস্কৃতিক সংগঠনের উপস্থিতিতে গঠিত হয় বঙ্গীয় প্রাদেশিক শান্তি সম্মেলনের প্রস্তুতি কমিটি। কমিটির যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন নরহরি কবিরাজ এবং ডা. নরেশ চন্দ্র ব্যানার্জি। এই প্রস্তুতি কমিটির উদ্যোগেই বিশ্ব শান্তি সম্মেলনের স্থায়ী কমিটির ডাকে ১৯৪৯-র ২রা অক্টোবর পশ্চিমবঙ্গের পালিত হয় 'বিশ্ব শান্তি দিবস'। ১৫ অক্টোবর (১৯৪৯) কলকাতায় বিশাল এক মিছিলও সংগঠিত হয়েছিল চীনের বিপ্লবকে স্বাগত জানিয়ে।

প্রথম বঙ্গীয় প্রাদেশিক শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৪৯ সালের ৪-৭ নভেম্বর। তবে শুধু প্রাদেশিক সম্মেলন নয়। কয়েকদিনের মধ্যেই প্রথম সর্বভারতীয় স্তরের শান্তি সম্মেলনও কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল— ১৯৪৯ সালের ২৪-২৬ নভেম্বর। ২৬ নভেম্বর কলকাতার রাস্তায় নেমেছিল মিছিলের ঢল। সম্মেলনের প্রকাশ্য সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল কলকাতার মনুমেন্ট ময়দানে।

১৯৪৯ সালের ১০ নভেম্বর সারা দুনিয়ায় 'যুদ্ধবিরোধী দিবস' পালনের জন্য বিশ্ব যুব সঙ্ঘ ডাক দিয়েছিল। সেই ডাকে সাড়া দিয়েছিল কলকাতাও।

১৯৫০ সালের ১৫-১৯ মার্চ স্টকহোমে বিশ্ব শান্তি সংসদের পক্ষ থেকে এক অধিবেশন হয়। এই অধিবেশন থেকেই আনবিক বোমা নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়ে প্রকাশ করা হয় একটি আবেদনপত্র— যা পরিচিত হয় 'স্টকহোম আবেদন' নামে। সারা বিশ্ব থেকে এই আবেদনের পক্ষে সই সংগ্রহ অভিযান চলে। বাংলাতেও বিপুলভাবে সাড়া মেলে। এর পরবর্তীতে শান্তির পক্ষে দ্বিতীয় বিশ্ব কংগ্রেসে ১৩ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের ছিলেন তিন জন— ড. মেঘনাদ সাহা, ড. প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ এবং আচার্য নন্দলাল বসু। পশ্চিমবঙ্গে এর পর ১৯৫১ সালের ৪-৮ মে কলকাতার মহম্মদ আলি পার্কে আবার অনুষ্ঠিত হয় প্রাদেশিক শান্তি সম্মেলন। এই সম্মেলন থেকেই একটি স্থায়ী কমিটি গঠিত হয়। কমিটির সভাপতি হয়েছিলেন ড. মেঘনাদ সাহা। সম্পাদক নির্বাচিত হন প্রমোদ সেনগুপ্ত। প্রাদেশিক শান্তি সম্মেলনে বার্তা পাঠিয়েছিলেন সোভিয়েত লেখক ইলিয়া এরেনবুর্গ এবং আলেকজান্দার ফাদায়েভ। এর পরই বোম্বাইয়ে ১১-১৩ মে (১৯৫১) অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় সারা ভারত শান্তি সম্মেলন। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন অবিভক্ত পাঞ্জাব প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির প্রাক্তন সভাপতি ড. সফিউদ্দীন কিচলু। এই সম্মেলন থেকেই গঠিত হয় অল ইন্ডিয়া পীস কাউন্সিল (এ আই পি সি)। প্রথম থেকেই এ আই পি সি ছিল বিশ্ব শান্তি

পরিষদের (ডব্লুউ পি সি) অনুমোদিত সংগঠন। এ আই পি সি-ই ১৯৭২ সালে ইন্ডিয়ান কমিটি ফর আফ্রো এশিয়ান সলিডারিটির (প্রতিষ্ঠা ১৯৫৫) সঙ্গে মিশে গিয়ে সংগঠিত করে অল ইন্ডিয়া পিস অ্যান্ড সলিডারিটি অর্গানাইজেশন। ফলত বলা যায় যে ছয় দশকেরও বেশি দীর্ঘ শান্তি ও মৈত্রী আন্দোলন ঐতিহ্য আমরা বহন করে চলেছি।

ষাট ও সত্তরের দশকে ভিয়েতনাম সংহতি আন্দোলন, পরবর্তী সময়ে নিকারাগুয়া ও কিউবা সংহতি আন্দোলনে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের অসামান্য ভূমিকা সেইসব দেশের মানুষ আজও স্মরণ করেন। এই সব সংহতি আন্দোলন শুধুমাত্র প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক পরিসরেই নয়, বাংলা সাহিত্য, সংস্কৃতি, সঙ্গীত, নাট্যজগতেও স্থায়ী প্রভাব ফেলেছে।

সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের প্রভাব ও পুনর্গঠন প্রয়াস

তবে বিশ্ব শান্তি পরিষদের মত, অল ইন্ডিয়া পিস অ্যান্ড সলিডারিটি কাউন্সিলকেও সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় পরবর্তী সময়ে কঠিন অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়েছিল। ১৯৯০-র দশকের গোড়ায় বিশ্ব শান্তি পরিষদের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক কাঠামোও কার্যত নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিল। ১৯৯৪ সালে মেক্সিকোতে একটি সম্মেলন থেকে জাপান, ফ্রান্স, পর্তুগাল, প্যালেস্তাইন ও কিউবার শান্তি আন্দোলনের উদ্যোগে ডব্লিউ পি সি'র সম্পাদকমণ্ডলী পুনর্গঠিত হয়। কিন্তু ১৯৯৯ সালে প্রায় তিন দশকের পুরনো সদর দপ্তর সরিয়ে নিতে হয় হেলসিঙ্কি থেকে। পরের বছর গ্রীসের রাজধানী এথেন্সে ডব্লিউ পি সি'র নতুন সদর দপ্তর চালু করা হয়। ২০০৪ সালে এই এথেন্সেই ৮০টি দেশের দুই শতাধিক প্রতিনিধির উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয় ডব্লিউ পি সি'র সংসদ।

ইতিমধ্যে এ আই পি এস ও-কে চাঙ্গা করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। দীর্ঘ সময় পর ২০০২ সালে দিল্লিতে এ আই পি এস ও-র একটি সম্মেলন আয়োজন করা হয়েছিল। পরবর্তীতে ২০০৭-র পাটনা জাতীয় সম্মেলনে এ আই পি এস ও ব্যাপকতর অংশের মানুষকে সমবেত করতে সক্ষম হয়েছিল। ফলে ২০০৮ সালের এপ্রিলে ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাসে এবং তার পর নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডুতে ২০১২ সালের জুলাই মাসে আয়োজিত বিশ্ব শান্তি সংসদ এবং বিশ্ব শান্তি সম্মেলনে এ আই পি এস ও অনেকটাই কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পেরেছে। কাঠমাণ্ডু সংসদ থেকে এ আই পি এস ও বিশ্ব শান্তি পরিষদের এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের কোঅর্ডিনেটরের দায়িত্ব পায়। কারাকাস সংসদের পর থেকে বিশ্ব শান্তি পরিষদের সম্পাদকমণ্ডলীতেও স্থান পেয়েছে এ আই পি এস ও।

বিশ্ব শান্তি পরিষদ গত প্রায় এক দশকে অনেকটা চাঙ্গা হলেও সাংগঠনিক সক্ষমতা এখনও আগের জায়গায় ফিরে যায়নি। তা এখনও পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই যাচ্ছে বলা যায়। তবে গত দু'দশকে আন্তর্জাতিক লগ্নি পুঁজি শাসিত সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে দেশে দেশে সাধারণ মানুষের লড়াই সংগ্রাম প্রতিরোধ বিশ্ব শান্তি আন্দোলনকে নতুনভাবে প্রাসঙ্গিকতা দিয়েছে।

সমস্ত মহাদেশেই আজ ক্রমশ জোরদার হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণআন্দোলন।

সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণআন্দোলনেরই শক্তি বৃদ্ধি করছে বিশ্ব শান্তি ও সংহতি আন্দোলন। একইভাবে বর্তমান অবস্থায় ভারতেও একটি শক্তিশালী ও সংগঠিত শান্তি ও সংহতি আন্দোলনের বর্ধিত প্রাসঙ্গিকতা অত্যন্ত স্পষ্ট।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

শান্তি ও সংহতি আন্দোলনকে নতুন পর্বে শক্তিশালী ও কার্যকর করতে হলে নতুন পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্যগুলিকে পর্যবেক্ষণ ও অনুধাবন করার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। সাম্রাজ্যবাদের অনুকূলে বিশ্ব শক্তি ভারসাম্য থাকলেও বর্তমান, বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদ নিত্যনতুন সংঘাত ও সংকটের মুখোমুখি হচ্ছে বারংবার। আন্তর্জাতিক লগ্নিপুঁজি নিয়ন্ত্রিত পুঁজিবাদের নয়া উদারবাদী বিশ্বায়ন যে স্থিতিশীল নয়, তা দেখিয়ে দিচ্ছে পুঁজিবাদী বিশ্বে গভীরতম সংকট। ২০০৭-০৮ সালে যে সংকট শুরু হয়েছে, তা ১৯৩০-র মহামন্দার পর কখনও এই মাত্রা পায়নি। বেপরোয়া ঋণ ও ফাটকার মাধ্যমে লগ্নিপুঁজির ধ্বংসাত্মক কার্যক্রমই এই সংকট ডেকে এনেছে। বৃহৎ ব্যবসা এবং বেসরকারী আর্থিক সংস্থাগুলিই সংকট গভীরতর করেছে। তাদের পরিত্রাণের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপে সাধারণ করদাতাদের বিপুল অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। বোঝা চাপানো হচ্ছে যথারীতি শ্রমজীবী জনগণের ঘাড়ে। ইউরোপে বিভিন্ন অংশে সরকারী ঋণ সংকটে ইউরোপীয় ইউনিয়ন পর্যন্ত বিপদের মুখে। গ্রীস সবচেয়ে বেশি সংকটগ্রস্ত। তবে পর্তুগাল, ফ্রান্স, জার্মানি, ব্রিটেনেও সমস্যা বেড়েছে যথেষ্ট। ফলত, উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে জীবিকা ও সামাজিক সুরক্ষার উপর আঘাতের প্রতিবাদে জনগণের ক্ষোভ বিক্ষোভ তীব্রতর হয়েছে।

পুঁজিবাদী বিশ্বের এই সংকটের মারাত্মক প্রভাব পড়ছে উন্নয়নশীল দেশগুলির উপর। উন্নয়নশীল দেশগুলির ঘাড়েই অর্থনৈতিক সংকট চালান করে দেবার চেষ্টা করছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বধীন সাম্রাজ্যবাদী শিবির। তবে, এই সংকটের মুখে 'বিকাশমান অর্থনীতি' হিসেবে চিহ্নিত দেশগুলি উন্নত দেশগুলির তুলনায় বেশি বৃদ্ধির হার ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নে জনগণতান্ত্রিক চীনের সাফল্য গোটা দুনিয়াকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ উন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি চীনের বাজারের দখল পেতে মরীয়া। আমরা দেখছি, সামগ্রিকভাবে এই অর্থনৈতিক সংকট বিশ্বের সামাজিক দ্বন্দ্বগুলিকেও নানাভাবে প্রভাবিত করছে। তীব্রতর করছে।

বিশ্বপুঁজিবাদী সংকট যত বাড়ছে ততই বাড়ছে সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী সামরিক চক্রান্ত। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তার প্রভাব ও আধিপত্য ধরে রাখতে ক্রমশ বেশি মরিয়া হয়ে উঠেছে এবং ব্যবহার করছে ন্যাটো বাহিনীকে। ২০১১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাজেট ছিল ৭০০ বিলিয়ন ডলার— সে দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি। বিশ্বে মোট সামরিক খাতে বরাদ্দের অর্ধেকই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার সহযোগীদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ পূরণ করতে ন্যাটোর এলাকা সম্প্রসারিত করা হচ্ছে। ২০০৮ সালে মার্কিন সরকার অতিরিক্ত ৩০ হাজার সেনা পাঠিয়েছিল

আফগানিস্তানে। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামে এইসব হানাদারি কার্যকলাপ বিপদ বাড়াচ্ছে।

আরব দেশগুলিতে গণতান্ত্রিক সংস্কারের জন্য জনবিদ্রোহগুলিকেও মার্কিন সরকার আগ্রাসীভাবে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে তার আধিপত্য বাড়ানোর লক্ষ্যে। তিউনিশিয়ার পর মিশরেও জনবিদ্রোহগুলিকে বিপথে চালিত করতে ওয়াশিংটন তৎপর। তার জমানা বদলের নীতির অর্থ কী তা আমরা দেখেছি লিবিয়ায়। আফ্রিকায় তার আধিপত্য বাড়াতে লিবিয়ায় রাষ্ট্রপতি গদ্দাফিকে হত্যা করতে নামানো হয়েছিল ন্যাটো বাহিনীকে। সিরিয়াতেও বেআইনীভাবে হস্তক্ষেপ করে গায়ের জোরে জমানা বদলের ছক এঁটেছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য ইরান। পশ্চিম এশিয়ায় তৈল সম্পদের উপর নিরঙ্কুশ দখল কায়েম করাই ওয়াশিংটনের লক্ষ্য। ইউরোপীয় ইউনিয়নও সম্পূর্ণ বেআইনীভাবে ইরানের তেলের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে ২০১২ সালের ১ জুলাই থেকে। প্যালেস্তাইনে ইজরায়েল তার আগ্রাসী নীতি পরিবর্তন না করলেও খোদ সে-দেশে জীবনযাত্রার মানের অবনতি হওয়ায় গণবিক্ষোভ বাড়ছে। এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার সামরিক উপস্থিতি বাড়াতে তৎপর। সম্প্রতি সিঙ্গাপুরে মার্কিন রাষ্ট্রপতি এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে তাদের অবস্থান সম্পর্কে নতুন নীতি ঘোষণা করেছে। মার্কিন নৌবহরের ৫০ ভাগ আটলান্টিক মহাসাগর এবং ৫০ ভাগ প্রশান্ত মহাসাগরে থাকতো এযাবৎকাল। কিন্তু নতুন নীতি অনুযায়ী মার্কিন নৌবহরের শতকরা ৬০ ভাগ থাকবে এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে।

জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া, ফিলিপাইনস এবং থাইল্যান্ডে অবস্থিত মার্কিন সামরিক ঘাঁটিগুলি আরও শক্তিশালী করা হবে। আদতে চীনকে চাপে রাখার জন্য সাম্রাজ্যবাদের কৌশল কার্যকর করতে ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে নতুন করে স্ট্রাটেজিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে তৎপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

সাম্রাজ্যবাদের সামরিক কৌশল ও প্রবণতাগুলি আন্তর্জাতিক লগ্নিপুঁজি শাসিত বিশ্বায়নের সঙ্গেই সম্পর্কযুক্ত। নয়া উদারবাদের নাম করে বেপরোয়াভাবে তারা অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক নানা জরুরী ক্ষেত্রে অবাধ হস্তক্ষেপের সুযোগ চাইছে। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির বিলগ্নিকরণ, ব্যাঙ্ক, বীমা, কৃষি, পেনশন, বিদ্যুৎ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খুচরো ব্যবসা, এমনকি নদীর জল— প্রায় সর্বক্ষেত্রই খুলে দিতে হবে বহুজাতিক পুঁজির জন্য। দেশের মানুষের স্বার্থের কী হবে— সে সব ভাবা চলবে না। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য উন্নয়নশীল দেশগুলির খাদ্য ব্যবস্থার উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা। কৃষিকাজ থেকে শুরু করে বীজ, সার, কীটনাশক, সেচ, কৃষি ফসল বাণিজ্য ও বিপণন ইত্যাদি সবক্ষেত্রেই নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে চাইছে মার্কিনী পশ্চিমী গুটিকয় একচেটিয়া বহুজাতিক কোম্পানি। প্রত্যন্ত গ্রামের একজন সাধারণ কৃষকও আজ প্রত্যক্ষভাবে আক্রান্ত।

বিশ্ব পুঁজিবাদের বিবেকহীন লুঠেরা চরিত্রের পরিণতিতে বাড়ছে জলবায়ুর সংকটও।

কিয়োটো প্রোটকল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মানতেই চায়নি। কার্বন নির্গমনের দায় সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি চাপিয়ে দিতে চাইছে উন্নয়নশীল দেশগুলির ঘাড়েই। যেরকমভাবে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তারা রাষ্ট্রসংঘ-সহ আন্তর্জাতিক রীতি নীতির তোয়াক্কা করছে না, একইভাবে তারা একতরফা নীতি নিয়ে চলছে পরিবেশ সংক্রান্ত প্রশ্নেও।

শিক্ষা সংস্কৃতি গণমাধ্যমের ক্ষেত্রেও নিরঙ্কুশ একাধিপত্য কায়েম করতে বেপরোয়া হয়ে উঠেছে সাম্রাজ্যবাদী শিবির। নয়া উদারবাদের দাওয়াই মাফিক বহুজাতিক পুঁজি অবাধ বিনিয়োগের সুযোগ কাজে লাগাতে চাইছে শিক্ষা সংস্কৃতি মিডিয়ার ক্ষেত্রেও। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মতাদর্শগত প্রতিরোধকে দুর্বল করতে কোটি কোটি ডলার তারা বিনিয়োগ করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল এনডাওমেন্ট ফর ডেমোক্র্যাসি'র মতো সংস্থাগুলি বিশ্বজুড়ে মিডিয়ার মগজ ধোলাইয়ের কাজে অতিমাত্রায় সক্রিয়। লাতিন আমেরিকায় ওয়াশিংটনের নির্দেশ না-মেনে চলা দেশগুলিতে বৃহৎপুঁজি নিয়ন্ত্রিত মিডিয়াকে যেভাবে অন্তর্ঘাতমূলক অপকর্মে ব্যবহার করা হচ্ছে, তাকে লাতিন আমেরিকার বিশেষজ্ঞরা চিহ্নিত করেছেন 'মিডিয়া সন্ত্রাস' হিসেবে। শান্তি ও সংহতি আন্দোলনও অনেক সময়ই বহুজাতিক পুঁজিনিয়ন্ত্রিত মিডিয়ার বিভ্রান্তিমূলক প্রচারের শিকার।

একইভাবে ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতাবাদ, মৌলবাদ, জাতিগত বিদ্বেষ, খণ্ড জাতীয়তাবাদ, পরিচিতিসত্ত্বার রাজনীতি, উত্তর আধুনিকতাবাদের মত প্রবণতাগুলিকে চাঙ্গা করা হচ্ছে। আসলে সাম্রাজ্যবাদ মানেই যেমন যুদ্ধ, সংঘাত, অস্ত্র প্রতিযোগিতা— তেমনই উগ্র প্রতিক্রিয়ার রাজনীতি ও মতাদর্শের বেসাতি তার মজ্জাগত।

তবে এতদ্‌সত্ত্বেও জীবনযাত্রার মানের উপর আক্রমণের বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ বাড়ছে। সংগঠিত ও কার্যকর রাজনৈতিক বিকল্প সবক্ষেত্রে স্পষ্ট নয় একথা সত্যি। কিন্তু প্রতিরোধ আন্দোলন তীব্রতর হচ্ছে, দাবি উঠছে জনস্বার্থবাহী বিকল্প নীতির। লাতিন আমেরিকায় বামমুখী সরকারগুলির নীতি ও যৌথ কার্যক্রম তথাকথিত 'ওয়াশিংটন ঐকমত্য'কে ভেঙে জনস্বার্থবাহী বিকল্প নীতি তুলে ধরছে।

বিশ্ব শক্তি ভারসাম্যে বহু মেরু প্রবণতাগুলি আজ অনেক স্পষ্টতর। লাতিন আমেরিকায় বলিভারিয়ান বিকল্প উদ্যোগের পরিণতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডাকে বাদ দিয়ে গঠিত হয়েছে নতুন আন্তরাষ্ট্রীয় মঞ্চ 'সেলাক'। চীন ও রাশিয়ায় যৌথ উদ্যোগে 'সাংহাই সহযোগিতা সংস্থা' ক্রমশ সংহত হয়ে উঠছে। ২০০৯ সালে ব্রাজিল, রাশিয়া ভারত ও চীনকে নিয়ে যে 'ব্রিক' গঠিত হয়েছিল, ২০১১ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে 'ব্রিকস'। 'ব্রিকস' আন্তর্জাতিক মঞ্চে উন্নয়নশীল বিশ্বের জন্য আরও বেশি অধিকার দাবি করছে।

ভারতের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির বর্তমান অবস্থায় ভারতের মতো দেশের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আন্তর্জাতিক শক্তি ভারসাম্যের বর্তমান স্তরে ভারতের মতো দেশ স্বাধীন নীতি অনুসরণ

করলে একদিকে তা জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করে; অন্যদিকে তা বহু মেরুত্বের প্রবণতাগুলিকে সংহত করে সাম্রাজ্যবাদকে চাপে রাখতে সাহায্য করে। ফলত তা যুদ্ধ ও সংঘাতের পরিবেশকে দূরে রাখতেও সাহায্য করে।

কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি, ভারতকে তার স্ট্রাটেজিক পার্টনারে পরিণত করার জন্য মার্কিনী চাপ বিগত সময়ে বেড়েছে। ভারতের অভ্যন্তরে মার্কিন হস্তক্ষেপ এখন নতুন মাত্রা লাভ করেছে। বিশেষত মার্কিনী কর্তাব্যক্তিরা ভারত সফরে এসে এমন সব ঘোষণা করছেন, যা অনেক সময়ই আমাদের দেশের মর্যাদার পক্ষে হানিকর। মার্কিন চাপের মুখেই পরমাণু চুক্তিতে রাজি হয়েছিল ভারত সরকার। ইরান থেকে প্রাকৃতিক গ্যাস ও তেল আমদানির প্রশ্নে সমঝোতা করছে ভারত। আরব দেশগুলির জনগণের অনুভূতির তোয়াক্কা না-করে ভারত ইজরায়েলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়েছে। শুধু এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলেই নয়, আরব ভূখণ্ডেও মার্কিন আধিপত্যকামী নীতির সহযোগী হিসেবে ভূমিকা পালনের জন্য ভারতের উপর চাপ বেড়েছে। আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংস্থায় পরমাণু প্রশ্নে ভারত অন্তত চারবার ভোট দিয়েছে ইরানের বিরুদ্ধে। যদিও ইরান প্রশ্নে ওয়াশিংটনের স্বার্থ কখনই ভারতের স্বার্থবাহী নয়। জাতীয় স্বার্থে বিশ্ব রাজনীতিতে বিদ্যমান বহু মেরুত্বের প্রবণতাগুলিকে কাজে লাগানোর জন্য স্বাধীন বৈদেশিক নীতি ভারতের পক্ষে অপরিহার্য।

আসলে যত আন্তর্জাতিক লগ্নিপুঁজির চাপে নয়া উদারনীতির পথে এগোচ্ছে, ততই আমাদের দেশের মার্কিন নির্ভরতা বাড়ছে। আর যত মার্কিন নির্ভরতা বাড়ছে, ততই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আমাদের জাতীয় স্বার্থ। সাম্রাজ্যবাদ ঠিক এটাই চায়।

ভারতের স্বাধীন ও জোটনিরপেক্ষ বিদেশ নীতির পক্ষে জনমত গড়ে তুলতে এ আই পি এস ও-র মতো সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে ব্যাপকতম অংশের মানুষকে সমবেত করতে হবে। একইভাবে সাম্রাজ্যবাদ কীভাবে আমাদের দেশ ও দেশের মানুষের উপর বিচিত্রভাবে সংকটের বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে সে ব্যাপারেও সাধারণ মানুষকে আরও সচেতন করতে হবে। দেশ ও দেশের মানুষের স্বার্থে সাম্রাজ্যবাদের বিপদ মোকাবিলায় ব্যাপকতম মানুষকে সমবেত করার দেশপ্রেমিক কর্তব্য এ আই পি এস ও ক্লান্তিহীনভাবে পালন করে যাবে।

শান্তি ও সংহতি আন্দোলন : বিকাশমান ও বহুমাত্রিক

শান্তি ও সংহতি আন্দোলন একটি বিকাশমান ও বহুমাত্রিক গণআন্দোলন। এ কারণেই তা জীবন্ত ও প্রাসঙ্গিক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বে দ্বিমেরু বিশ্বে যুদ্ধোন্মাদনা ও পরমাণু অস্ত্রদৌড় শুরু করেছিল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার সহযোগীরা। সাম্রাজ্যবাদের এই আগ্রাসী কৌশলের প্রধান লক্ষ্য ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি। একইসঙ্গে উন্নয়নশীল দেশগুলির স্বাধীন ও সার্বভৌম অবস্থানের প্রতিও সাম্রাজ্যবাদ ধারাবাহিকভাবে আক্রমণাত্মক থেকেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বে শান্তি ও

সংহতি আন্দোলনকে বিশ্বব্যাপী সংগঠিত রূপ দিতে বিশ্ব শান্তি পরিষদ গড়ে উঠেছিল। সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের পর সাম্রাজ্যবাদ নতুন মাত্রায় আগ্রাসী অবস্থান নিয়েছে। যুদ্ধ, সংঘাত ও অস্ত্র প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে শান্তি প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে শান্তি ও সংহতি আন্দোলন লড়াই জারি রাখবে সাম্রাজ্যবাদের যাবতীয় কৌশলের বিরুদ্ধে। শান্তি ও সংহতি আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী সামরিক কৌশলের বিরোধিতা করার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক লগ্নিপুঁজি শাসিত নয়া উদারনৈতিক আর্থিক বাণিজ্যিক নীতির বিরুদ্ধেও গণপ্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্রিয়। প্রতিটি দেশের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের জন্য শান্তি ও সংহতি আন্দোলন লড়াই করে। মৌলবাদী হিংসা, সন্ত্রাসবাদ, জাতিগত সংঘর্ষ, সাম্প্রদায়িক সংঘাতের বিরুদ্ধে শান্তি ও সংহতি আন্দোলন মানুষকে সমবেত করে। পরিবেশ রক্ষা করে সুস্থায়ী উন্নয়নের পক্ষে শান্তি ও সংহতি আন্দোলন সদাসক্রিয়। মিডিয়া এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পক্ষে শান্তি ও সংহতি আন্দোলন লড়াই করে।

ব্যাপকতম মঞ্চ

শান্তি ও সংহতি আন্দোলনে ব্যাপকতম অংশের মানুষকে সমবেত করতেই হবে। বহুবিধ দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রবণতার যৌথ মঞ্চে পরিণত করতে হবে শান্তি ও সংহতি আন্দোলনকে। সমবেত করতে হবে সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে— শ্রমিক, কৃষক, কর্মচারী, ছাত্র-যুব-মহিলা, প্রযুক্তিবিদ, চিকিৎসক, লেখক, সাংবাদিক, শিল্পী বুদ্ধিজীবী, সংস্কৃতি কর্মী, শিক্ষাবিদ, ক্রীড়াবিদ, সমাজকর্মী-সহ সব অংশের মানুষকে। এ প্রসঙ্গে ওয়ার্ল্ড পীস কাউন্সিলের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি জোলিও কুরীর অসামান্য কথাটি আমরা এখানে স্মরণ করতে পারি— 'Peace is everybody's business'। শান্তি ও সংহতির বিষয়টি প্রতিটি মানুষেরই মাথা ঘামানোর বিষয়।

শান্তি ও সংহতি আন্দোলন এখন বেশি প্রাসঙ্গিক

এ কথা বলা হয়তো অতিকথন হবে না যে, বিশ্বায়নের এই পর্বে এসে শান্তি ও সংহতি আন্দোলন সম্ভবত আরও জরুরী, আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। বেপরোয়া আন্তর্জাতিক লগ্নিপুঁজির স্বার্থে নয়া উদারবাদী অর্থনীতি কার্যকর করতে সাম্রাজ্যবাদ এখন অনেক বেপরোয়া। যেকোনো অজুহাতে, যেকোনো দেশে যুদ্ধ বাধাতে সে দ্বিধাহীন। পৃথিবীর একটি প্রান্তও এই বিপদ থেকে মুক্ত নয়। কৃষকের সার, বীজ থেকে শুরু করে জীবনদায়ী ওষুধ, শিক্ষা থেকে টেলিকম, কিংবা পেট্রোলিয়াম— সাম্রাজ্যবাদ সাধারণ মানুষের জীবনযাপনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে সর্বাত্মকভাবে কব্জা করতে চায়। একইসঙ্গে এই ক্রমবর্ধমান বিপদ সম্পর্কে মানুষকে বিভ্রান্ত করার মগজধোলাইয়ের সুবিপুল আয়োজন আজ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বৈপ্লবিক রূপান্তরের ফলে অভূতপূর্বভাবে আগ্রাসী ও ব্যাপক। এ অবস্থায় শান্তি ও সংহতি আন্দোলনের প্রাসঙ্গিকতা ও গুরুত্ব অতীতের যেকোনো সময়ের তুলনায় বেশি। সাধারণ মানুষের চেতনার স্তর মাথায় রেখেই বিপদ

সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়াস চালাতে হবে। নিরন্তর ও আন্তরিক প্রচেষ্টার ভিত্তিতেই সর্বাত্মক করে তুলতে হবে প্রতিরোধের লড়াইকে। ব্যাপকতম অংশের মানুষের সচেতন ও সংগঠিত প্রতিরোধ লড়াইকে। ব্যাপকতম অংশের মানুষের সচেতন ও সংগঠিত প্রতিরোধ সাম্রাজ্যবাদের বিপদের মোকাবিলা করতে পারে। শান্তি ও সংহতি আন্দোলনের এই সময়োপযোগী বর্ধিত দায়িত্ব সম্পর্কে সজাগ হয়েই আমাদের প্রস্তুত হতে হবে।

রাজ্য শাখার বিভিন্ন কর্মসূচী

বিগত ২০০৭ সালের প্রস্তুতি সভার পরবর্তীতে সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শাখা সংগঠনের মূল নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী লাগাতার কর্মসূচী পালনের চেষ্টা করে গেছে। রাজ্যে এই সময়ে পালিত কর্মসূচীগুলির সংক্ষিপ্ত একটি তালিকা নিচে দেওয়া হল—

২০০৭

৭ আগস্ট : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজাবাজার বিজ্ঞান কলেজের মেঘনাদ সাহা সভাগৃহে এ আই পি এস ও রাজ্য শাখার আহ্বানে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা থেকে আসন্ন ভারত-ভিয়েতনাম মৈত্রী উৎসবের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সভাপতি জ্যোতি বসু। কার্যকরি সভাপতি হাসিম আবদুল হালিম। সাধারণ সম্পাদক রবীন দেব।

৯ আগস্ট : এ আই পি এস ও রাজ্য শাখার উদ্যোগে নাগাসাকি দিবস উদযাপন। ধর্মতলায় এই উপলক্ষে মিছিল। সর্বস্তরের বিশিষ্ট নাগরিকরা অংশ নেন।

২-৪ সেপ্টেম্বর : কলকাতা ভারত ভিয়েতনাম মৈত্রী উৎসব। নেতাজী ইন্ডোরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উৎসবের উদ্বোধন করেন বিদেশমন্ত্রী প্রণব মুখার্জি। উপস্থিত ছিলেন ভিয়েতনাম মুক্তি ংগ্রামের কিংবদন্তী নেত্রী মাদাম বিন্, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু, মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধ্যক্ষ হাসিম আবদুল হালিম, বামফ্রন্ট সভাপতি বিমান বসু, পল্লব সেনগুপ্ত, রবীন দেব প্রমুখ। কলকাতা এবং যাদবপুর-সহ বর্ধমান, কল্যাণী, উত্তরপাড়া প্রভৃতি স্থানে অনুষ্ঠান।

৪ সেপ্টেম্বর : বঙ্গোপসাগরে ভারত-মার্কিন নৌবাহিনীর যৌথ মহড়ার প্রতিবাদে আয়োজিত বিভিন্ন কর্মসূচিতে এ আই পি এস ও রাজ্য শাখার সদস্যরাও সক্রিয়ভাবে অংশ নেন।

২০০৮

১৫-১৬ ফেব্রুয়ারি : নয়া দিল্লিতে বিশ্ব শান্তি পরিষদের এশিয়া প্যাসিফিক রিজিওনাল কনসালটেটিভ মিটিং-এ পশ্চিমবঙ্গ শাখার দু'জন প্রতিনিধি অংশ নেন।

৮-১৩ এপ্রিল : ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাসে আয়োজিত ডব্লিউ পি সি'র বিশ্ব শান্তি সংসদ ও বিশ্ব শান্তি সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শাখার তরফে অধ্যক্ষ খগেন্দ্রনাথ অধিকারী, শ্যামল সেনগুপ্ত, অধ্যাপক অমলেন্দু দেবনাথ, ড. সৌমেন্দ্রনাথ বেরা ও ড. প্রদীপ দত্তগুপ্ত কারাকাস গিয়েছিলেন।

২৪-২৫ মে : ছত্তিশগড়ের রায়পুরে এ আই পি এস ও-র সারা ভারত কমিটির বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শাখার কয়েকজন সদস্য অংশ নেন। বৈঠকে পাটনা সম্মেলন (২০০৭) পরবর্তী কাজকর্ম নিয়ে আলোচনা হয়।

১৪-১৫ জুন : শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বোতে চতুর্থ এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় আঞ্চলিক কিউবা সংহতি সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গ থেকে সাংসদ শ্যামল চক্রবর্তী, মদন ঘোষ, রবীন দেব, প্রদীপ ভট্টাচার্য, আভাস রায়চৌধুরী প্রমুখ অংশ নেন।

২৬ জুলাই : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজাবাজার বিজ্ঞান কলেজের মেঘনাদ সাহা অডিটোরিয়ামে 'মনকাদা দিবস' উপলক্ষে কিউবার প্রতি সংহতি জানিয়ে সভা। বক্তা ছিলেন রবীন দেব, মানব মুখার্জি, শ্রুতিনাথ প্রহরাজ প্রমুখ।

৬-৯ আগস্ট : জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে আনবিক বোমার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে রাজ্য শাখার তরফে অনন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ও কল্লোল মজুমদার অংশ নেন।

১০-১৫ আগস্ট : ভিয়েতনামে দ্বিতীয় ভিয়েতনাম-ভারত মৈত্রী উৎসবে রবীন দেবের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ থেকে ৫৫ জন প্রতিনিধি অংশ নেন।

১ সেপ্টেম্বর : কলকাতায় সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত মিছিলে রাজ্য শাখার সদস্যরাও অংশ নেন।

৯ সেপ্টেম্বর : এ আই পি এস ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শাখার উদ্যোগে কলকাতার মেট্রো চ্যানেলে প্যালেস্তাইন সংহতি দিবস উদ্‌যাপন। প্যালেস্তাইন জনগণের প্রতি সংহতি জানিয়ে প্রচারিত আবেদনপত্রে তিরিশ হাজারেরও বেশি মানুষের স্বাক্ষর।

২৬ সেপ্টেম্বর : আমেরিকার মায়ামিতে বেআইনীভাবে বন্দী কিউবার পাঁচজন নাগরিকের মুক্তির দাবিতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এইচ এল রায় মেমোরিয়াল হলে এ আই পি এস ও রাজ্য শাখা এবং ন্যাশনাল কমিটি ফর সলিডারিটি উইথ কিউবার উদ্যোগে সংহতি সভা। পাঁচ বন্দীর অন্যতম ফার্নান্দো গন্ডালেজের স্ত্রী শ্রীমতী রোজা অরোরা ফ্রেইজানেস এবং তাঁদের আইনজীবী শ্রীমতী লুরিস পিনেরো সিয়েরা সভায় উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন।

১৪-১৬ ডিসেম্বর : হায়দরাবাদে আয়োজিত আফ্রো এশিয়ান পিপলস্ সলিডারিটি অর্গানাইজেশনের অষ্টম কংগ্রেসে এ আই পি এস ও পশ্চিমবঙ্গ শাখার তরফে রবীন দেব, অঞ্জন মুখার্জি, বিনায়ক ভট্টাচার্য, শ্রীমতী প্রদীপ্তা কানুনগো, সৌমেন্দ্রনাথ বেরা ও প্রদীপ দত্তগুপ্ত অংশ নেন।

২০০৯

৭ জানুয়ারি : এ আই পি এস ও পশ্চিমবঙ্গ শাখার উদ্যোগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙা হলে প্যালেস্তাইনের জনগণের প্রতি সংহতি জানিয়ে সভা। সভাপতি রবীন দেব। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক সুরঞ্জন দাস, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী ড. শ্রীকুমার মুখার্জি, অঞ্জন মুখার্জি, সৌমেন্দ্রনাথ বেরা, অনন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

৩০ মার্চ : এ আই পি এস ও পশ্চিমবঙ্গ শাখার উদ্যোগে আন্তর্জাতিক প্যালেস্তাইন দিবস উদ্‌যাপন। দক্ষিণ কলকাতার যোগেশ মঞ্চে সভা।

১২-১৩ জুন : কাঠমাণ্ডুতে ওয়ার্ল্ড পীস কাউন্সিলের এশিয়া প্যাসিফিক কনসালটেটিভ মিটিং-এ পশ্চিমবঙ্গ শাখার তরফেও কয়েকজন অংশগ্রহণ করেন।

৬-৯ আগস্ট : জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে আণবিক বোমার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গ শাখার তরফে অধ্যাপক বিপ্লব চক্রবর্তী অংশ নেন।

১ সেপ্টেম্বর : রাজ্য শাখার উদ্যোগে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী দিবস উপলক্ষে কলকাতার মেট্রো চ্যানেলে বিকাল ৪টা থেকে ৮টা পর্যন্ত সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

২০১০

২৯ জানুয়ারি : চাইনীজ পিপলস অ্যাসোসিয়েশন ফর পীস অ্যান্ড ডিসআর্মামেন্টের প্রতিনিধিদের কলকাতা সফর। রাজ্য শাখার প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক।

২০-২১ ফেব্রুয়ারি : কাঠমাণ্ডুতে এশীয় শান্তি সম্মেলনে রজত বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী প্রদীপ্তা কানুনগো এবং স্বপ্না মুখার্জি যোগ দেন।

১৯-২০ মার্চ : লাওসের রাজধানী ভিয়েনতিয়েনে পঞ্চম এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় আঞ্চলিক কিউবা সংহতি সম্মেলনে অঞ্জন মুখার্জি ও সৌমেন্দ্রনাথ বেরা অংশ নেন।

২৮-৩০ এপ্রিল : এ আই পি এস ও রাজ্য শাখার উদ্যোগে গগনেন্দ্র প্রদর্শনশালায় লেনিনের উপর প্রকাশিত ডাকটিকিটের প্রদর্শন। ডাকটিকিটগুলির সংগ্রাহক ছিলেন শুভ্র চন্দ্র। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন বামফ্রন্ট সভাপতি বিমান বসু। উপস্থিত ছিলেন রবীন দেব, ড. শ্রীকুমার মুখার্জি প্রমুখ।

১ সেপ্টেম্বর : কলকাতার মেট্রো চ্যানেলে আয়োজিত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী দিবস পালন।

২১ নভেম্বর-৫ ডিসেম্বর : রজত ব্যানার্জি, অনিন্দিতা সর্বাধিকারী, প্রবীর দেব এবং পাপিয়া অধিকারী পশ্চিমবঙ্গ থেকে এ আই পি এস ও-র তরফে চীন সফরে যান।

২০১১

১২-১৩ মার্চ : কাঠমাণ্ডুতে আয়োজিত দক্ষিণ এশিয়া শান্তি সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গ থেকে

প্রতিনিধিবৃন্দ (অশোক গুহ, দীপঙ্কর মজুমদার, মৌসুমী রায়, স্বপন সরকার, শ্রীমতী মহম্মদ তারুন্নাম, অশোক অধিকারী প্রমুখ) যোগদান করেন।

৪-৫ জুন : বাংলাদেশের ঢাকায় আয়োজিত এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় শান্তি সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গ থেকে রাজ্য শাখার তরফে কয়েকজন যোগদান করেছিলেন।

২৬ জুলাই : অবনীন্দ্র সভাগৃহে রাজ্য শাখার তরফে 'মনকাদা দিবস' পালন। কিউবান ইনসিটিউট অফ ফ্রেন্ডশিপ উইথ দ্য পিপলস্-র তরফে রিগোবার্তো জারজা রোজা, পল্লব সেনগুপ্ত, রবীন দেব প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

১ সেপ্টেম্বর : সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দিবস উপলক্ষে মেট্রো চ্যানেলে রাজ্য শাখার উদ্যোগে সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

২০১২

১৯-২০ মার্চ : কলকাতায় বিশ্ব শান্তি পরিষদের এশিয়া প্যাসিফিক কনসালটেটিভ মিটিং।

১৭-১৮ জুলাই : নয়াদিল্লিতে ব্রিকস ভুক্ত দেশগুলির শান্তি সংগঠনগুলির বৈঠকে রাজ্য শাখার তরফে অধ্যাপক বিনায়ক ভট্টাচার্য ও অধ্যাপক প্রদীপ দত্তগুপ্ত অংশ নেন।

২০-২৩ জুলাই : কাঠমাণ্ডুতে বিশ্ব শান্তি পরিষদের সংসদ ও বিশ্ব শান্তি সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গ থেকে অংশ নেন রবীন দেব, ড. শ্রীকুমার মুখার্জি, অঞ্জন মুখার্জি, সৌমেন্দ্রনাথ বেরা, মৌসুমী রায়।

২৬ জুলাই : কলকাতার নেহরু চিলড্রেন্স মিউজিয়াম সভাগৃহে 'মনকাদা দিবস' উপলক্ষে রাজ্য শাখার উদ্যোগে সভা। বক্তব্য রাখেন রবীন দেব, হাফিজ আলম সৈরানি, ভানুদেব দত্ত, অঞ্জন মুখার্জি প্রমুখ।

৯ আগস্ট : রাজ্য শাখার উদ্যোগে নাগাসাকি দিবস উপলক্ষে ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউট কলেজের সভাগৃহে সভা। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন রবীন দেব, অধ্যাপক আনন্দদেব মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক সুবিমল সেন, অধ্যাপক বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য প্রমুখ। সঙ্গীত পরিবেশন করেন পূরবী মুখোপাধ্যায়।

১ সেপ্টেম্বর : কলকাতায় সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সুবিশাল মিছিলে রাজ্য শাখার সদস্যরা অংশ নেন।

আগামী দিনের কর্মসূচী

অভিজ্ঞতা থেকে এটা স্পষ্ট যে, সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থার মত সংগঠনের কাছে সময়ের চাহিদা ক্রমশ বাড়ছে। বিশেষত আমাদের রাজ্যে এখন দেশী-বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি আরও বেশি করে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। গণতন্ত্র-বিরোধী, যুক্তিবাদ-বিরোধী নানা প্রবণতা পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে নিজেদের প্রভাব বাড়াতে

চাইছে। এ অবস্থায় আগামী দিনে আমাদের প্রিয় সংগঠন দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট কর্মসূচী রূপায়নে উদ্যোগ নেবে।

১। আগামী ছ'মাসের মধ্যে এ আই পি এস ও-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্মেলন করা হবে। রাজ্যের পরিস্থিতির কারণে আগে উদ্যোগ নেওয়া সত্ত্বেও রাজ্য সম্মেলন করা যায়নি।

২। সমাজের বৃহত্তর অংশের মধ্যে, বিশেষত, শ্রমজীবী মানুষ, তরুণতর অংশ, ছাত্র-যুব-মহিলা, ক্রীড়াবিদ, চিকিৎসক, প্রযুক্তিবিদ, বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক, সংস্কৃতিকর্মীদের সঙ্গে আরও নিবিড় যোগাযোগ স্থাপন ও তা বজায় রাখার জন্য আমাদের আরও যত্নবান হতে হবে। নতুনতর অংশের মানুষকে শান্তি ও সংহতি আন্দোলনে সমবেত করার নির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

৩। রাজ্য সংগঠনের তহবিল সংগ্রহ অভিযান নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে সংগঠিত করতে হবে। সদস্য সংগ্রহ অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে।

৪। গত পাঁচ বছর রাজ্য শাখা নিয়মিত নানা কর্মসূচী পালন করেছে। আগামী দিনেও বিভিন্ন সাংগঠনিক কর্মসূচী গ্রহণ করে রাজ্য শাখার কাজের পরিধি আরও বিস্তার করতে হবে। জেলাস্তরে বিভিন্ন কর্মসূচী রূপায়নের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

৫। এককভাবে নানা অনুষ্ঠান করার পাশাপাশি অন্যান্য সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যৌথভাবে অনুষ্ঠান করার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

৬। প্রচারমূলক কাজকর্ম আরও সংগঠিত ও সংহত করতে আর্থিক সামর্থ সাপেক্ষে কিছু উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। যেমন, জরুরী বিভিন্ন বিষয়ে পুস্তিকা, ফোল্ডার প্রকাশ করা, রাজ্য শাখার নিজস্ব ওয়েবসাইট চালু করা, রাজ্য শাখার নিজস্ব মুখপত্র প্রকাশ করা ইত্যাদি।

৭। সংগঠনের রাজ্য দপ্তরকে আরও সক্রিয় করে তোলার জন্য নির্দিষ্ট উদ্যোগ নেওয়া হবে।

আগামী রাজ্য সম্মেলনে আমরা এ ব্যাপারে আরও বিস্তারিত আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব।

শান্তি ও সংহতি আন্দোলন জিন্দাবাদ!

এ আই পি এস ও জিন্দাবাদ!